১৪৭

আজকের কাগজ

তারিখ 30 JAN 1995 পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা ঃ শিক্ষার্থীর না অভিভাবকের?

বিনোদ দাশগুপ্ত

প্রতি বছরের মত এবারও কোন ব্যতিক্রম হয়নি। বরং সমস্যাটি যেন দিন দিন আরো প্রকটতর হয়ে উঠছে। স্কুলে ভর্তি সমস্যা নিয়েই যে আমরা কথা বলতে চাচ্ছি তা শিরোনামেই স্পষ্ট। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাস আসলেই অগণিত অভিভাবকের ঘুম হারাম হয়ে যায়। কেবল তা নয় উল্লেখিত সময়টি ভরা শীতের মৌসুম, কিন্তু প্রচণ্ড ভর্তি সমস্যার কারণে অতিরিক্ত টেনশানজনিত রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার দরুণ শীতও সম্ভবত বেমালুম ভুলে যাওয়ার মত অবস্থায় এসে পৌঁছেন কোন কোন অভিভাবক।

ভাবতে অবাক লাগে প্রতি ১০০টি আসনের জন্যে আড়াই হাজার দরখাস্ত পড়েছে নাকি কোন কোন স্কুলে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এরূপ অকল্পনীয় অবস্থা দেখা দেয় কিনা আমাদের জানা নেই। তবে এটা খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। পশ্চাৎপদতা এবং অনুন্নত এবং অপরিকল্পিত অর্থনৈতিক অবস্থার লক্ষণ প্রায়। উল্লেখিত ঘটনাটি ঘটেছে আমাদের এ ঢাকা শহরেরই নামকরা একটি স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে। সেখানে দুই শিফট মিলে প্রথম শ্রেণীর চারশত আসনের জন্যে আবেদন পত্র পড়েছে দশ হাজার। আবেদনকারীর সকল শিক্ষার্থীর ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয়েছে, না-কি সেখানেও কিছু বাছাই এর ব্যাপার ছিল সে বিষয়েও আমরা সঠিক জানিনা। কিন্তু আমাদের খটকা অন্য জায়গায়।

প্রথম শ্রেণীতে যারা ভর্তি হতে চায় তাদের বয়স গড়ে ধরা যায় ৫ থেকে ৬ বছরের মধ্যে। আরো ধরে নেয়া যায় যে এরা ইতিপূর্বে কোন স্কুলে পড়েনি কিংবা কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়নি। অর্থাৎ ভর্তি বা অন্য কোন পরীক্ষা বলতে কি বুঝায় সে বিষয়ে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এমন এক অবস্থায় তারা কি ভর্তি পরীক্ষা দেবে সেটাই আমাদের বোধগম্য নয় এবং এদের পরীক্ষার ফলাফল ও স্কুল কর্তৃপক্ষ কিভাবে যাচাই করেন সেটাও আমরা বুঝি না। তবু ধরা যাক এর মধ্যে থেকেও তারা কিছু যোগ্য শিক্ষার্থীকে বাছাই করতে সক্ষম হন (যদিও তাদের সে বাছাই যে নির্ভূল তেমন কথা তারা নিজেরাও হয়তো জোর দিয়ে দাবি করতে পারবে না)।

আরো একটি ব্যাপার লক্ষণীয় যে সব স্কুলে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদেরকে ভর্তি করাতে চান সেখানে মূলত প্রথম শ্রেণীতে ছাড়া উপরের অন্য কোন শ্রেণীতে ভর্তি করার সুযোগ প্রায় থাকেই না বলা যায়। কোথাও কোথাও অবশ্য পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণীতে কিছু কিছু ভর্তির সুযোগ থাকে। অন্যান্য শ্রেণীতে কোন কোন স্কুলে সামান্য সুযোগ থাকলেও তা একেবারে নামমাত্র। স্কুলগুলোর ভাব দেখে মনে হয় কোন শিক্ষার্থী অন্য কোথাও থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আসলে আকাঙ্ক্ষিত কোন স্কুলে ভর্তি হওয়ার চিন্তা ছেড়ে দিয়েই তাদেরকে আসতে হবে। এটাকে কি কোন দেশের শিক্ষা বিকাশের ক্ষেত্রে একটা সুষ্ঠ পরিবেশ বলে ধরে নেয়া যায় না। স্কুলগুলোর মনোভাব অনেকটা এই যে তারা তাদের শিক্ষার্থীকে প্রথম শ্রেণী থেকে এস এস সি ফাইনাল পর্যন্ত একই মানে গড়ে তুলতে চান। অথচ কার্যত কোন স্কুলই তা করে না, করতে পারে না। তারা প্রধানত একবার সুনাম হয়ে যাওয়ার সুযোগটাই গ্রহণ করে। কিন্তু অনেক স্কুলেই উপযুক্ত মানের শিক্ষা দেয়া হয় না বলে যথেষ্ট অভিযোগ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে রাজধানী শহরের স্কুলে ভর্তি সমস্যা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছি সেখানের সব স্কুলেই ভর্তির ব্যাপারে যে একই সংকট হয় না তা সকলেরই জানা। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে তো ডেকে খুঁজে এনেও ছাত্র পাওয়া যায় না। অনেক বেসরকারি মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের অবস্থাও এর চেয়ে খুব ভাল নয়। মুষ্টিমেয় প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর স্কুল বলে খ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলোতেই কেবল ভর্তির এই প্রচণ্ড ভীড়। এগুলোর বেশিরভাগই আবার বেসরকারি স্কুল (সরকারি স্কুল ও অবশ্য কিছু আছে) এবং টিউশন ফি ও অন্যান্য ব্যয় ও এসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অত্যাধিক। এরপরও এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে এমন ভীড় হওয়ার কিছু আর্থ-সামাজিক কারণ অবশ্যই রয়েছে। প্রথমত উচ্চতর পর্যায়ের যোগাযোগ, সামান্য ব্যতিক্রমী কিছু পাঠ্যক্রম; বোর্ডের পরীক্ষায় মোটামুটি ভাল ফল এবং ভাল ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বাছাই করে ভর্তি করানো, এবং মোটামুটি কড়াকড়িভাবে প্রযোজ্য কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা ইত্যাদি নানা কারণে ভাল প্রতিষ্ঠান বলে এদের সুনাম হয়ে গেছে। ফলে উচ্চবিত্ত এবং স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত সমাজে (যারা অন্তত সন্তানদেরকে বিদেশে বা দেশের ক্যাডেট কলেজে পড়াবার সুযোগ পান না) এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি ঝোঁক অন্তত বেশি। এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্তানদেরকে ভর্তি করিয়ে তারা একদিকে ভাল ফলের আশা করেন। অন্যদিকে অন্তত এস এস সি পর্যায়ের শেষ ক্লাস পর্যন্ত স্কুল পাল্টাবার কষ্ট বা ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকতে চান। এ ছাড়া এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে সন্তানদেরকে পড়াতে না পারার মধ্যে একটু সামাজিক মর্যাদাবোধও রয়েছে বলে তারা মনে করতে পারেন। সামাজিক স্তর বিন্যাসের সিঁড়ি বেয়ে ক্রমাগত উপরে উঠার চেষ্টা আর কি।

কিন্তু এরূপ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করিয়ে অভিভাবকদের বিশেষতঃ মায়েদের আর এক ধরনের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ শুরু হয় বলে আমাদের ধারণা। সে যুদ্ধ হল সন্তানদের ভাল ফল নিশ্চিত করাবার যুদ্ধ। কারণ বেশিরভাগ নাম করা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শ্রেণী কক্ষে ভাল পড়াশোনা করানো বা শিক্ষা দেওয়া হয় না। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বা নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের বাইরে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর কিছু অতিরিক্ত পাঠ্যক্রম চাপিয়ে কৃতিত্ব নিতে চান এবং অত্যন্ত মামুলিকভাবে হলেও গোটা পাঠ্যক্রম শেষ

করতে পারুক বা না পারুক তার উপর পরীক্ষা তারা ঠিকই নেয়। এ কারণে অভিভাবকরা আরো অতিরিক্ত পয়সা ব্যয় করে গৃহ শিক্ষক নিয়োগের (তাও অনেক সময় সংশ্লিষ্ট স্কুল শিক্ষককে) মাধ্যমে সন্তানদেরকে পাশ করাবার ও ভাল ফল করাবার কাজে সারা বছর ব্যস্ত থাকতে বাধ্য হন। এর ওপর আবার স্কুল থেকে বের করে দেবার বা এক শ্রেণীতে দুবার রাখার হুমকি তো আছেই। কারণ এই স্কুলগুলোতে শ্রেণী পরীক্ষা পাসের হার শতকরা ৫০%। এজন্যই আমরা বলতে চেয়েছি যে ভর্তি পরীক্ষা, শ্রেণীর পরীক্ষা বা বোর্ডের পরীক্ষা কোনটাই আসলে শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নয়, মূল পরীক্ষা তাদের অভিভাবকদের। কারণ কোমল মতি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে যথারীতি পড়তে বসাবার জন্যেও অভিভাবকদের মাথার চুল তুলে ফেলার জোগাড় হয়। শহরে মধ্যবিত্তদের এক অংশের মধ্যে ধারণা জন্মেছে যে কোন মূল্যে সন্তানদের জন্যে আকর্ষণীয় একটা শিক্ষাজীবন ক্যারিয়ার কিনে নিতে হবে।

উপরে বর্ণিত গোটা ব্যাপারটাই সামাজিক, রাষ্ট্রীয় অসুস্থতারই পরিচায়ক। কোন দেশের সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় এমন বিসদৃশ পরিস্থিতির কথা ভাবা যায় না। এই পরিস্থিতির কারনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তথা গোটা শিক্ষাঙ্গনে অনাকাঙ্ক্ষিত এক শ্রেণী বিভাজন ও সৃষ্টি হয়েছে। এমনিতেই তো সরকারিভাবে কয়েক রকমের শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান দেশে চালু রয়েছে। এর মধ্যে ক্যাডেট প্রতিষ্ঠানগুলো, মডেল স্কুল বা কলেজ, সাধারণ পাঠ্যক্রম অনুসারী বোর্ডের অধীন শিক্ষা ব্যবস্থা ও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াও ইংরেজী মাধ্যমের অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে আবার আমাদের উপরের বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে যে বোর্ডের সাধারণ পাঠ্যক্রম অনুসারী প্রতিষ্ঠানগুলোকেও অলিখিত এক পন্থায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে ভাগ করার একটা ব্যবস্থা প্রায় সম্পন্ন হয়ে গেছে। এ অবস্থাও কোন দেশের জন্যে কল্যাণকর হতে পারে না। কারণ এটা শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী বিভাজন নয়, নাগরিকদের মধ্যে ও প্রকৃতপক্ষে এই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নিরবে কঠোর শ্রেণী বিভাজন হয়ে চলেছে। নাগরিকদের মধ্যে এই বিভাজন যতই বাড়বে ততই বাড়তে থাকবে রাজনৈতিক অনৈক্য ও বিভেদ। তার শেষ পরিণতিতে উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক অগ্রগতিও অবরুদ্ধ হতে বাধ্য এবং এখনও তা অবরুদ্ধ। কিছু লোকের রাতারাতি ফেঁপে ফুলে উঠার মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক কোন ব্যাপার নেই।

এটা এক অর্থনৈতিক ভয়াবহ পরিস্থিতির ইঙ্গিতবাহী। কিন্তু এমন অবস্থাও সরকার কিংবা দেশে কর্মরত রাজনৈতিক দলগুলোর তেমন কোন উদ্বেগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। শিক্ষা কর্তৃপক্ষও সম্পূর্ণ নির্বিকার। আর গণবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের তো এটাই কাম্য। আমরা জানি যে ব্যবস্থা দেশের মধ্যে একবার বিস্তৃত শিকর গেড়ে ফেলেছে তা সহজে উৎপাটন করা সম্ভব নয়। কিন্তু ধাপে ধাপে এ অবস্থার অবসানের জন্যে সব মহলকে সক্রিয় ও সচেতনভাবে এগিয়ে আসতে হবে। প্রথম অবস্থায় অন্তত বোর্ডের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সৃষ্ট বিভাজন রেখা দূর করার চেষ্টায় ব্রতী হতে হবে। তার মানে এ নয় প্রথম শ্রেণীর স্কুলগুলোকে ঠেলে নীচের দিকে নামিয়ে দিতে হবে আমাদের বক্তব্য হল ঠিক এর উল্টাটাই করতে হবে। অর্থাৎ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে সরকারি বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার মান এমনভাবে উন্নত করতে হবে যাতে ভর্তির চাপ শুধু মাত্র শহরের মুষ্টিমেয় নাম করা স্কুলে সীমাবদ্ধ না থাকে। সংখ্যার দিক থেকে শহরেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঘাটতি আছে অবশ্যই (গ্রামে তো বটেই)। কিন্তু বিদ্যমান স্কুলগুলোর বেশিরভাগের অবস্থা নিম্নমানের বা হতাশাব্যঞ্জক না হলে ভর্তি সংকটের ব্যাপারটি এমন গুরুতর আকার ধারণ করতো না নিশ্চয়ই।

> এমনিতেই তো সরকারিভাবে কয়েক রকমের শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান দেশে চালু রয়েছে। এর মধ্যে ক্যাডেট প্রতিষ্ঠানগুলো, মডেল স্কুল বা কলেজ, সাধারণ পাঠ্যক্রম অনুসারী বোর্ডের অধীন শিক্ষা ব্যবস্থা ও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াও ইংরেজী মাধ্যমের অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে আবার আমাদের উপরের বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে যে বোর্ডের সাধারণ পাঠ্যক্রম অনুসারী প্রতিষ্ঠানগুলোকেও অলিখিত এক পন্থায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে ভাগ করার একটা ব্যবস্থা প্রায় সম্পন্ন হয়ে গেছে। এ অবস্থাও কোন দেশের জন্যে কল্যাণকর হতে পারে না। কারণ এটা শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী বিভাজন নয়, নাগরিকদের মধ্যে ও প্রকৃতপক্ষে এই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নিরবে কঠোর শ্রেণী বিভাজন হয়ে চলেছে।

বেশিরভাগ স্কুলেই উপযুক্ত মানের কথা দূরে থাক প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও নেই, শিক্ষা দান প্রক্রিয়া অত্যন্ত নিম্নমানের, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম শৃংখলাও প্রায় অনুপস্থিত। কাজেই অভিভাবক বা ছাত্র-ছাত্রীদের এইসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি আগ্রহ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কিন্তু সরকারসহ সব সামাজিক রাজনৈতিক শক্তি সচেষ্ট হলে এ করুন অবস্থার অবসান ঘটানো মোটেই দুঃসাধ্য নয়। দেশে শিক্ষকেরও অভাব নেই। অর্থাৎ তাত্ত্বিকভাবে এরূপ অভাব থাকার কথা নয়। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত যথেষ্ট যুবক, যুবতী দেশে এখন বেকার। ন্যূনতম চলার উপযোগী বেতনের নিশ্চয়তা পেলে এদের অনেকেই অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করতে রাজি হবেন। তাদেরকে শিক্ষকতার কাজে একটু দক্ষ করে তোলার জন্যে একটু প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এতে অল্প খরচে অত্যন্ত কল্যাণকর একটি জাতীয় পুনর্গঠনের কাজও সম্ভব। অর্থহীন বাগাড়ম্বর ও প্রচারণার মধ্যেও যে শিক্ষার তেমন কোন প্রসার ঘটছে না এবং দেশের বুক থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজটি অত্যন্ত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে সেই অবাঞ্ছিত অবস্থারও অবসান সম্ভব এই পথে। শিক্ষার মাধ্যমে কিছু সুবিধাভোগী উচ্চ শ্রেণীর লোক সৃষ্টি করার বদলে প্রকৃত গণশিক্ষা বিস্তারের জন্যেই অধিকতর ব্যয়ের মাধ্যমে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। রাজধানী ঢাকাসহ কয়েকটি বড় বড় শহরে আজ যে ভর্তি সংকট দেখা দিয়েছে সেটাকে একান্তই এক কৃত্রিম সমস্যা বলে আমরা মনে করি এবং বিভিন্ন মহলের সামান্য চেষ্টাতেই তা নিশ্চিতভাবে সমাধান করা সম্ভব। আমাদের ধারণা কোন কোন প্রভাবশালী মহলের সূক্ষ্ম ও সচেতন চক্রান্ত না থাকলে শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নয়, সরকারি অনেক উচ্চতর বিদ্যালয়েও ভর্তির কোন চাপ না থাকার যুক্তি থাকতে পারে না। এর পেছনে অযৌক্তিকভাবে তাই এক ধরনের অভিজাত শ্রেণী সৃষ্টির প্রচ্ছন্ন প্রয়াস আছে বলে আশঙ্কা হয়।

বিনোদ দাশগুপ্ত: প্রাবন্ধিক, কলামলেখক।